ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 194-201
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.449

চন্ডাল থেকে নমঃশূদ্র: আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে মতুয়া

আসানুর খাতুন, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
মহ: আজাহারউদ্দিন, *সহকারী শিক্ষক, পার্বতীপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the caste-based social system of ancient India, people belonging to the lower castes were subjected to exploitation, oppression, and persecution. Bengal was no exception to this reality. Even as the nineteenth century dawned, the intensity of such exploitation and oppression showed not the slightest sign of abatement. However, when this exploitation and oppression reached intolerable extremes, movements against the caste system emerged, and new religious ideologies came into being. Gradually, as they became conscious of the discrimination being meted out to them, people of the lower castes took to the path of agitation.

The Matua movement, founded by Harichand Thakur (1812–1878), was—in the context of its time—fundamentally anti-Brahminical and anti-casteist; it was a religious movement driven by the demand for social dignity. Following the passing of Harichand Thakur, his son, Guruchand Thakur (1847–1937)—serving as the principal spiritual leader of the Matua community—formulated plans for religious, social, and educational reforms, as well as for cultural upliftment. The primary demand of the Matua leadership was the official recognition of a new name—'Namasudra'—to replace the old, derogatory appellation of 'Chandal.

Keywords: Shudra, Chandala, Namashudra, Matua, Dalit, Bengal

প্রাচীন ভারতে ‘ঋগবেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত’– এ বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি[১]– অর্থাৎ বর্ণ কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে আছে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সর্বনিম্নে শূদ্র সম্প্রদায়।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের এই স্তর বিন্যাস ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রের বৈবাহিক আইনে বিবাহ হল ‘অনুলোম’ বিবাহ আর শাস্ত্রের মতের বাইরের বিবাহ হল প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহকারীরা এবং বিবাহজাত সন্তান সন্ততিরা ধর্মহীন এবং হীন মর্যাদার অধিকারী। বহু বছর ধরে পৃথক পৃথক বর্ণের মেলামেশা ও বিবাহের ফলে সহস্রাধিক বর্ণসংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে, তারা চতুর্বর্ণের বাইরে অবস্থান করে এবং চতুর্বর্ণের শেষ বর্ণ শূদ্রের থেকেও হীন মর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য জাতি বলে প্রতিপন্ন হয়।[২]

অস্পৃশ্য জাতিগুলি শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং শুচি-অশুচি বিচারে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, এক পুকুরে জল নেওয়ার অধিকার, একসঙ্গে ভোজনের অধিকার ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের মানুষকে স্পর্শ করা বা তাদের হাতে জলগ্রহণ করাকে ঘৃণ্য বলে মনে করত।[৩] চতুর্বর্ণের বাইরের এই বিশাল সংখ্যক অস্পৃশ্য মানুষ তাদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় অধিকার ও স্থায়ী পরিচিতি অর্জনের জন্য স্থানীয় ধর্মীয় মতাদর্শের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়গত মর্যাদা বা সম্মানজনক অবস্থান অনুসন্ধান করেছে। ধর্মীয় ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা নিজস্ব সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতির স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে চেষ্টা করেছে।

বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার হলেও অস্পৃশ্যরা বা অতিশূদ্ররা সেই ধর্মকে গ্রহণ করেন। তবে তাদের নিজেদের স্থানীয় দেবদেবী, আচার সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি। Richard M Eaton তাঁর গ্রন্থ 'The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)[৪] ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে যে চারটি তত্ত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল সূফীদের সহজ সরল জীবন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ষোড়শ শতকে বাংলায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে।[৫] তাঁর হাতে শুধু বৈষ্ণব ধর্মই জনপ্রিয় হয়েছে তাই নয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে এই ধর্মকে জনপ্রিয় করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আগে এই ধর্ম ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের করায়ত্ত। অপরদিকে নিম্নবর্ণের মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হচ্ছিল। জাতিভেদ প্রথা তাদের জীবন বিষময় করে তুলেছিল। সেই সামাজিক পরিমণ্ডলেই চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তিনি আপামর জনসাধারণের মধ্যে নাম ও প্রেম ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তি ঘটানো। বাংলার দলিত, নির্যাতিত মানুষগুলি তাঁর কাছ থেকে আশার আলো দেখেছিল। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে উচ্চবর্গের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেন। যার জন্য তাঁকে বাংলার ইতিহাসে 'প্রথম বিপ্লবী' বলা যেতে পারে।[৬] চৈতন্যদেব বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষকে জাতপাতহীন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। শুধু জাত-কুলই নয় বিদ্যা বিত্ত নির্বিশেষে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী এবং নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের মতো বৈষ্ণবদের চেষ্টা ও প্রেরণায় সমাজের নিচুস্তরের অস্পৃশ্যরা বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করে।

চন্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়
সে হো মোর মুঞিঃ তার জানিয় নিশ্চয়।।[৭]

এই চন্ডাল জনগোষ্ঠী বাংলার এক বৃহত্তম অংশ জুড়ে চন্ডাল বা চাঁড়াল বা চাঙ নামে অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। সংখ্যার দিক থেকে চন্ডালরা পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড়ো জনজাতি আর সমগ্র বাংলাদেশের নিরিখে তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয় (৯.৮ শতাংশ)। প্রধানত পূর্ব বাংলার ৬টি জেলায় বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা ছিল চণ্ডালদের বসতি।[৮] সারা বাংলার চন্ডাল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে।

কিন্তু, অস্পৃশ্যতা বাংলার সমাজে কখনই খুব বড়ো সমস্যা ছিল বলে মনে হয়নি। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওয়া পুরাণে বাংলার চন্ডালদের অন্ত্যজ এবং সংকর জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু, সত্যি সত্যি তাদের অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত কিনা তার কোনো ইঙ্গিত নেই।[৯]

ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গল কাব্য গুলিতে চন্ডালদের উল্লেখ আছে যারা গ্রাম বা নগরে বাস করত। মনু যাদের অন্তবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যারা গ্রাম বা নগর সীমান্তের বাইরে বাস করে– চন্ডালরা সেরকম ছিল বলে মনে হয়না।[১০] তবে একথা ঠিক যে বাংলার উচ্চবর্ণের লোকেদের নানা ধরনের সামাজিক অধিকারের জন্য চন্ডাল জাতিসহ অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতি সমূহের সঙ্গে উচ্চবর্ণের বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়।

ব্রিটিশ আসনাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক নতুন ভদ্রলোক শ্রেণির সৃষ্টি করে। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেনের মতো ব্রাহ্মসমাজীরা জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫০ সালে জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির আইন পাশ করা থেকে শুরু করে ১৮৭২ সালে 'Special Marriage Act' পাশ করার মাধ্যমে বলা হল যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো জাতি বা ধর্মের কোনো নারীকে বিবাহ করতে পারে, যদি তারা এই বিবাহকে আইনত নথিভুক্ত করে এবং সেইসঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম বা ঐ ধরনের প্রচলিত কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস করেনা। প্রধানত কেশব সেনের অনুগামীদের চেষ্টায় এই আইনটি গৃহীত হয়।[১১] ফলে এই জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আইন কিন্তু অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জন্য তৈরি হয়নি। যদিও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অস্পৃশ্য জাতিগুলির তুলনায় বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ছিল। কিন্তু, বাংলার ভদ্রলোক সমাজের মুখের ভাষায় অস্পৃশ্যদের প্রতি শ্লেষ ফুটে উঠত। তাদের চাঁড়াল, দুর্বৃত্ত, নরাধম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা চন্ডালদের ধর্মীয় সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ নিতেন না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত অংশ নিতেন তাদের জাতিচ্যুত করা হত বা 'চাঁড়ালের বাওন' বলে বিদ্রুপ করা হত।[১২]

ঔপনিবেশিক শাসনে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হয় যার ভিত্তি জন্ম নয়, কর্ম অর্থাৎ যোগ্যতা। এর ফলে পুরোনো জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হল এবং উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন পেশাভিত্তিক জাতি সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। কৃষিজীবী হিসেবে চিহ্নিত জাতিগুলি ছিল রাজবংশী, চন্ডাল, বাগদি, ভুইমালি, বাউরি, কাউরা, পালিয়া, কোটাল ইত্যাদি। মৎসজীবী জাতিগুলি ছিল মূলত জেলে, কৈবর্ত, মালো, পাটনি, ঘাসি প্রভৃতি। মুচি চর্মকারের কাজে নিযুক্ত ছিল। ধোপারা নিযুক্ত ছিল কাপড় ধোয়ার কাজে এবং কাপড় বোনার কাজ করত পান বা চৌপালরা। হালালখোর, হাড়ি, মেথররা ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজ করত।[১৩]

সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল তার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতির বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বরং বর্ণবাদী ব্রাহ্মন্যকেন্দ্রিক জাতিভেদযুক্ত সমাজকেই দেশীয় সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে মেনে নিয়ে ছিল।

কিন্তু, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান জাতি সচেতনতার একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্থায়ী পরিচিতি নিয়ে যে টানাপড়েন বা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তার উৎস ছিল মনু রচিত আইন সংহিতা এবং স্মৃতিশাস্ত্র যাতে চতুর্বর্ণের বাইরের সম্প্রদায়গুলিকে বর্ণ হিসেবে কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এদের অবর্ণ, পশ্চাৎতম জাতি, অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য বলা হত।[১৪] এই অস্পৃশ্য জাতিগুলির প্রতি উচ্চবর্ণের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন–

> "আমি পল্লীগ্রামে গিয়ে দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্যজাতিতে চাষ করেনা, তাদের ধান কাটেনা, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয়না। অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে

তাহার অযোগ্য বলিয়াছে। বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দন্ড দিতেছি।”[১৫]

উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও শোষণের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম চন্ডালদের সংঘটিত প্রতিবাদ শুরু হয় ১৮৭২-৭৩ সালে, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উঁচুজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করে। উচ্চবর্ণের লোকেদের অভিযোগ ছিল– ১. চন্ডালদের মেয়েরা যথেচ্ছভাবে হাটে বাজারে যায়। ২. জেলখানায় ঝাড়ুদারের কাজ করে, নোংরা পরিষ্কার করে।[১৬] উচ্চবর্ণের লোকেদের এই অবজ্ঞা ও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার প্রেক্ষিতে চন্ডাল গ্রামপ্রধানরা একটি সভা করে। সভায় তারা সিদ্ধান্ত নেয়– ১. মহিলারা হাটে বাজারে যাবে না। ২. কৃষিকাজে ঘর ছাউনি দেওয়ার বা অন্য কোনোরকম কাজে উঁচুজাতের লোকেদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। এই আন্দোলন ছিল মূলত সামাজিক বয়কটের আন্দোলন। এই আন্দোলন অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তবে এই বয়কট সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। শুরুর দিকে প্রথম চার মাসের মাথায় ফরিদপুরের জেলাশাসক ওই অঞ্চলে সফরে গিয়ে দেখেন যে মাঠগুলি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে ঘরগুলি ছাওয়া হয়নি, আর কোনো নমঃশূদ্রকে দেখা যায়নি হিন্দু বা মুসলমানের কাজে এবং বাজারে কোনো নমঃশূদ্রণীকেও দেখা যায়নি। এই তথ্যটি প্রকাশ পায় ১৮৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল ৩৪০ সংখ্যক চিঠিতে, যা লিখেছিলেন ফরিদপুরের জেলাশাসক ঢাকা বিভাগের কমিশনারকে।[১৭] প্রথম আন্দোলনের সাফল্যের পরে এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এক সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যারা মতুয়া নামে পরিচিত হয়।

মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে। বাংলার দলিত শ্রেণীকে পথ দেখানোর জন্য আবির্ভাব হয় তাঁর। তিনি এক বৈষ্ণব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পতিত তথা অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের উন্নতির জন্য তাদের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি মতুয়া নামে ধর্মমতটির প্রবর্তন করেন।[১৮] হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত ধর্মের সাথে বৈষ্ণব ধর্মের বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ‘মতুয়া’ কথার অর্থ করলে দাড়ায় হরিনামে মাতোয়ারা। তারকচন্দ্র সরকার রচিত শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থে আছে–

‘হরি বোলা দেখে উপহাস করে যত
সবে বলে ও বেটারা হরি বোলা মতো।
কেহ বলে জাতি নাশা সকল মতুয়া।
দেশভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া।।’

মতুয়া সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের অভিমত হল শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে ও প্রেমে যারা মাতয়ারা তারাই মতুয়া নামে আখ্যা প্রাপ্তি হয়েছেন।[১৯] মতুয়া ধর্মের অন্যতম কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতে, ‘নামে প্রেমে মাতোয়ারা এবং প্রচলিত ধ্যান ধারনায় যাদের বিশ্বাস নেই কিংবা চলতি প্রথার বিরোধী তারাই মতুয়া’।[২০] মতুয়াদের হা তে বিজয়ের প্রতীক বিজয় ডঙ্কা, বিপ্লবের প্রতীক লাল নিশান এবং যুদ্ধ জয়ের পূর্ণ নিশাদের প্রতীক শিংগা তুলে দেওয়া হয়। বহুযুগের পতিত অবস্থা বা নিজ্জনের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে নরনারীকে একসঙ্গে দুর্বার গতিতে ছুটে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন হরিচাঁদ। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[২১]

হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতক সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অন্যান্য বৈষ্ণব গুরুদের মতো তিনিও প্রচার করেছিলেন ব্যক্তিগত ভক্তি, জাতিভেদের অবসান ও সর্ব সাম্যের মতাদর্শ। এই ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে দুটি ধারা প্রকট হতে শুরু করে– একটি হল অস্পৃশ্য অভিজাতদের ধারা আর অপরটি

হল কৃষক অনুগামীদের। ইতিপূর্বেই নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে দাবী করেছিল তাদের চন্ডাল নামের পরিবর্তে নমঃশূদ্র নামের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের। ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম জনগণনা শুরু করেন। ১৮৮১ সালে জনগণনার পরেই সিলেট জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডব্লু. সি. ম্যাকফারসন নাম বদল নিয়ে এক আদেশ জারি করেন। সেখানে বলা হয় যে, সমস্ত নমঃশূদ্র জাতিকে 'নমঃশূদ্র' বলেই উল্লেখ করতে হবে, কখনও 'চঙ্গ', 'চন্ডাল' বা অন্য কোনো কুৎসিত অপমানজনক শব্দ লেখা হবেনা। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডব্লু. সি. ম্যাকফারসনের আদেশ কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা যাবেনা। এই একই কথা বলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন লোকগণনার অধ্যক্ষ জে. এম. সি. সুইনি (আই.সি.এস.)।[২২]

কিন্তু, তা সত্ত্বেও ১৮৯১ এবং ১৯০১ সালের লোকগণনা সারণিতে লেখা হল নমঃশূদ্র বা চন্ডাল। সুতরাং, বলা যায় যে সরকারি আদেশ সত্ত্বেও 'চন্ডাল' শব্দটি পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়নি। ১৯০৭ সালে ছোটোলাটের সাথে গুরুচাঁদ ঠাকুর দেখা করেন এবং চন্ডাল নামটি তুলে দেওয়ার জন্য শুরু করেন আন্দোলন। আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব তিনি তুলে দেন সংগঠকদের হাটে এবং তিনি এর নেতৃত্ব দেন। নাম বদলানোর আর্জি নিয়ে সংগঠকরা লোকগননা মহাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান ডা. সি. এস. মীড গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহযোগিতায় মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ওড়াকান্দিতে। তিনি নাম বদলের বিষয়টি জানতেন; সেইজন্য ১৯১১ সালে লোকগণনার পূর্বে গুরুচাঁদকে অনুরোধ করেন লোকগণনা কর্তৃপক্ষের কাছে বেশি বেশি দরখাস্ত পাঠাতে। খুব দ্রুত গতিতে সংগঠকরা অন্যান্যদের কাছে এই বার্তা পাঠালেন। ডা. সি. এস. মীডের কথা মতো প্রচুর দরখাস্ত জমা পড়ে লোকগণনার মহাধ্যক্ষ ই. এ. গেইট এর কাছে। ওড়াকান্দি থেকে পাঠানো দরখাস্তে সি. এস. মীডের সুপারিশ ছিল।[২৩] অবশেষে ১৯১১ সালের লোকগণনার রিপোর্টে চন্ডাল নামের বদলে লেখা হয় নমঃশূদ্র। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বের ফলেই এটা করা সম্ভব হয়েছিল।

গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্রদের উপরের দিকে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার জন্য তিনি নমঃশূদ্রদের উৎসাহ দেন এবং উপায় খোঁজার কথা বলেন। মহাকবি মহানন্দ হালদারের শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত থেকে পাওয়া যায়, "কিসে কিসে অর্থ বাড়ে শ্রীগুরু শেখায়, অর্থ উপার্জনের নীতি নমঃশূদ্রে পায়"।[২৪] ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যমূলক নীতির বিরোধী চেতনাকে অবলম্বন করে বিকল্প সামাজিক সাম্য ও যুগপযোগী আদর্শের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের সমাজের পুনর্নির্মাণের কথা বলেন। নমঃশূদ্রদের ওপরে ওঠার পথের দুটি অন্তরায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের চোখে পড়ে– নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা। শিক্ষা অজ্ঞতা দূর করতে পারে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে আসে সম্পদ। এই দুটি একত্রে মানুষকে সমাজের ওপরের দিকে উঠতেও সাহায্য করে। এর সঙ্গে গুরুচাঁদ যোগ করেন শাসক শ্রেণীর সহযোগিতা। ফলে ১৮৮১ সালে ওড়াকান্দিতে নমঃশূদ্র শিশুদের জন্য খোলা হয় একটি পাঠশালা। পড়ে অন্য জেলাতেও স্কুল খোলার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর জন্য অনেক সময় মিশনারীদের সাহায্যও নেওয়া হত। তবে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে নমঃশূদ্রদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৩.৩ শতাংশ এবং ১৯১১ সালে হয় ৮.৯ শতাংশ।[২৫] অর্থাৎ শিক্ষার শতাংশ সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তবে একথা ঠিক যে গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে নমঃশূদ্ররা এক নতুন আশা এবং পথ খুঁজে পায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

১৯০৬ সালে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে। পরে 'জাগরণ' ও 'পতাকা' নামে আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[২৬] এই পত্রিকাগুলি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল নমঃশূদ্রদের সরকারি চাকুরীতে স্থান করে নেওয়ার উৎসাহ প্রকাশ। গুরুচাঁদ বুঝেছিলেন শুধুমাত্র শিক্ষিত করলেই হবেনা, নমঃশূদ্রদের চাকরীর ব্যবস্থা করাও দরকার।

উচ্চবর্ণের প্রাধান্যকে প্রতিহত করার জন্য এবং নমঃশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে মতুয়া ধর্মপ্রবর্তকরা আয়োজন করেন একাধিক সভার। হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে কীর্তন আসরের এবং মহোৎসবের আয়োজন করতেন। এইসব আসরগুলিতে ধর্ম ও সমাজকল্যাণমূলক নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হত। **১৮৮১-১৯৩০** সালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে যে সভা হয়েছে সেখানে সমাজ বিষয়ক প্রশ্নগুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। **১৯০২** সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সমিতি'। এই সমিতির কাজ ছিল আন্দোলনের সমন্বয়সাধন করা।[২৭] এইসব সভাগুলিকে বলা হত 'উত্তোলন সভা'। হরিচাঁদ ঠাকুরের পরে গুরুচাঁদ ঠাকুর এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন উত্তোলন সভার মধ্য দিয়ে। গ্রামের মোড়লরা এই সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং প্রথা অনুযায়ী এদের পান সুপারি দিয়ে সম্মানিত করা হত। প্রত্যেক প্রতিনিধি তার নিজের অঞ্চলের এবং নিজের সমাজের সমস্যার কথা বলতেন। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হত। প্রথম উত্তোলন সভা বসে **১৮৮১** সালের খুলনা জেলার মোল্লার হাট থানার দত্তডাঙ্গা গ্রামে নমঃশূদ্র জমিদার ঈশ্বর গায়েনের বাড়িতে। এই সভার সভাপতি ছিলেন গুরুচাঁদ স্বয়ং। বিভিন্ন জেলা থেকে ষোলো জন নেতা এই সভায় তাদের বক্তব্য রাখেন। সভায় আলোচনার মূল বিষয় ছিল আত্মসহায়তা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি এবং এও সিদ্ধান্ত হয় যে নিয়মিতভাবে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।[২৮]

১৮৯১ সালে অনুষ্ঠিত উত্তোলন সভার কিছু অভিনব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিছু কাজ তারা করত না কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। যেমন– পুকুর খনন করা, পুকুরের মাছ বিক্রি করা, ইটের বাড়ি তৈরি করা, নারকেল গাছের চারা বোপন করা ইত্যাদি। এই কাজগুলিকে অমঙ্গলের প্রতীক মনে করে তারা করত না। সভাসমিতির প্রচারের মধ্য দিয়ে এগুলি বন্ধ করার জন্য নেতৃবৃন্দ প্রচার করেন।[২৯] অর্থাৎ এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে থাকেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নমঃশূদ্র কল্যাণ সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি শিক্ষা বিস্তার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করার মতো নানা কাজ করত। গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর 'লক্ষ্মীর গোলা' তৈরির নির্দেশ দেন। এই লক্ষ্মীর গোলা থেকে পাঠশালার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, দরিদ্র মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা, দুর্ভিক্ষের সময় গরীবদের ধান বিতরণ করা হত। এই সাহায্য শুধুমাত্র নমঃশূদ্রদের দেওয়া হতনা। সমাজের পিছিয়ে পড়া সকলকে এই সাহায্য করা হত।[৩০]

প্রত্যেক পরিবারের অপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল একমুঠো চাল রাখতে সঞ্চয় ভাঁড়ারে প্রত্যেকদিন রান্নার আগে। আর গ্রাম্য কমিটি তা সংগ্রহ করবে। প্রতিটি সদস্যকে মাসে এক আনা করে চাঁদা দিতে হবে গ্রাম্য কমিটিকে, সম্মিলনীকে দুআনা আর জেলা কমিটিকে চার আনা। পারলৌকিক, বিবাহে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যা ব্যয় হবে তার তিন শতাংশ দিতে হবে প্রত্যেক নমঃশূদ্রকে এই তহবিলে। আরও প্রস্তাব নেওয়া হয় এই মর্মে যে, কোনো নমঃশূদ্র কুড়ি বছরের নীচে কোনো কন্যাকে বিয়ে দিলে তিনি বহিষ্কৃত হবেন।[৩১]

১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হরিগুরুচাঁদ মিশন'। যার সংঘাধিপতি ছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর, পড়ে এর নাম হয় মতুয়া মহাসংঘ। এই মতুয়া মহাসংঘের মূল কাজ ছিল ধর্ম ছাড়াও, শিক্ষার প্রচার, কুসংস্কার দূর করা দরিদ্র মেধাবীদের জন্য শিক্ষাদান। অসহায় বিধবাদের জন্য আশ্রম তৈরি করা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের সাহায্য, পল্লী সংস্কার ইত্যাদি।[৩২]

বাংলার দলিত জাগরণে ও ঐক্যবদ্ধ করণে গুরুচাঁদ ছিলেন অগ্রদূত। সেই জন্য তিনি বলেছিলেন – 'দল নেই যার, বল নেই তার। উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে পতিত দলিতজাতিকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে হিন্দু সমাজের প্রান্তিক মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল মতুয়া ধর্মমত।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, দীপঙ্কর। নারী সমস্যা নারী মুক্তি। অনীক, সংখ্যা ৩–৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩): পৃ. ৩০।
২. সেন, সুকোমল। ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ। (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯১২), পৃ. ১২৭।
৩. সেন, সুকোমল। ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ। পৃ. ১৩২।
৪. Eaton, Richard M. "Mass Conversion to Islam: Theories and Protagonists," in The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 (Berkeley: University of California Press, 1993).
৫. রঞ্জন বল, মিহির। কর্মযোগী শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। (কলকাতা, ১৯৯৭), পৃ. ৫।
৬. সরকার, অনিল কুমার ও বিশ্বাস, অসিত।গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব: প্রসঙ্গ বাংলার মতুয়া উদ্বর্তন। (নিউ দিল্লি, ২০২৩), পৃ. ১৩।
৭. সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন বাংলা কীর্তনের ইতিহাস।(কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯), পৃ. ৫১।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর,। উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন। ১৮৭২–১৯৪৭, পৃ. ১২৭।
৯. বিশ্বাস, মিল্টন। বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত। (১৮৭২–২০১১) (গবেষণা প্রবন্ধ, মানবীবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২৪।
১০. বিশ্বাস, মিল্টন। বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত। পৃ. ২৪।
১১. মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ। জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ। (কলকাতা: কে. পি. বাগচি, ১৯৮১), পৃ. ৬০–৬১।
১২. Bandyopadhyay, Sekhar. Caste, Protest and Identity in Colonial Bengal: The Namashudras of Bengal, 1872–1947 (London: Curzon Press, 1997), পৃ. ১৭-১৮।
১৩. বাগ, স্বপন কুমার সম্পা.। বাংলার নিম্নবর্গীয় (তফশিল) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি। রূপ কুমার বর্মণ (অন্তরমুখ, ২০১৪), পৃ. ১০৯।
১৪. বিশ্বাস, মনোশান্ত. বাংলার মতুয়া আন্দোলন – সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ।(কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, মে ২০১৬), পৃ. ২৩।
১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ধর্মের অধিকার, রবীন্দ্র রচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড, শতবার্ষিকী সংস্করণ (১৯৬১; বিশ্বভারতী), পৃ. ৩৫৩।
১৬. বিশ্বাস, বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত, পৃ. ২৬।
১৭. Bengal Judicial Proceedings, 1873, 57।
১৮. বিশ্বাস, ভগবান চন্দ্র। শ্রীশ্রী হরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা। (কলকাতা, ১৯৯৫), মুখবন্ধ।
১৯. ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন। আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি। (ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৯৯৫), পৃ. ১০২।
২০. ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ। গুরুচাঁদ ও অন্ত্যজ জাগরণ । (কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ১।

২১. সরকার, অনিল কুমার ও বিশ্বাস, অসিত। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব: প্রসঙ্গ বাংলার মতুয়া উদ্বর্তন। (নিউ দিল্লি, ২০২৩), পৃ. ১৩।
২২. সরকার ও বিশ্বাস। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৫।
২৩. সরকার ও বিশ্বাস। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৬।
২৪. হালদার, আচার্য মহানন্দ। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। (কলিকাতা, ১৯৮২), পৃ. ৯৯।
২৫. সরকার, অনিল কুমার। গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৭।
২৬. সরকার, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৭।
২৭. সরকার, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৭।
২৮. হালদার, আচার্য মহানন্দ। শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত। পৃ. ১১০–১১৪, ১১৯–১২০।
২৯. বিশ্বাস, মনোশান্ত, বাংলার মতুয়া আন্দোলন। পৃ. ১২৮।
৩০. বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন। পৃ. ১২৮।
৩১. সরকার, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মীড সাহেব। পৃ. ১৯।
৩২. বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন। পৃ. ১২৮।